

ঢাকা মঙ্গলবার, ~~১৩ মে ২০২৩~~
30 may
2023

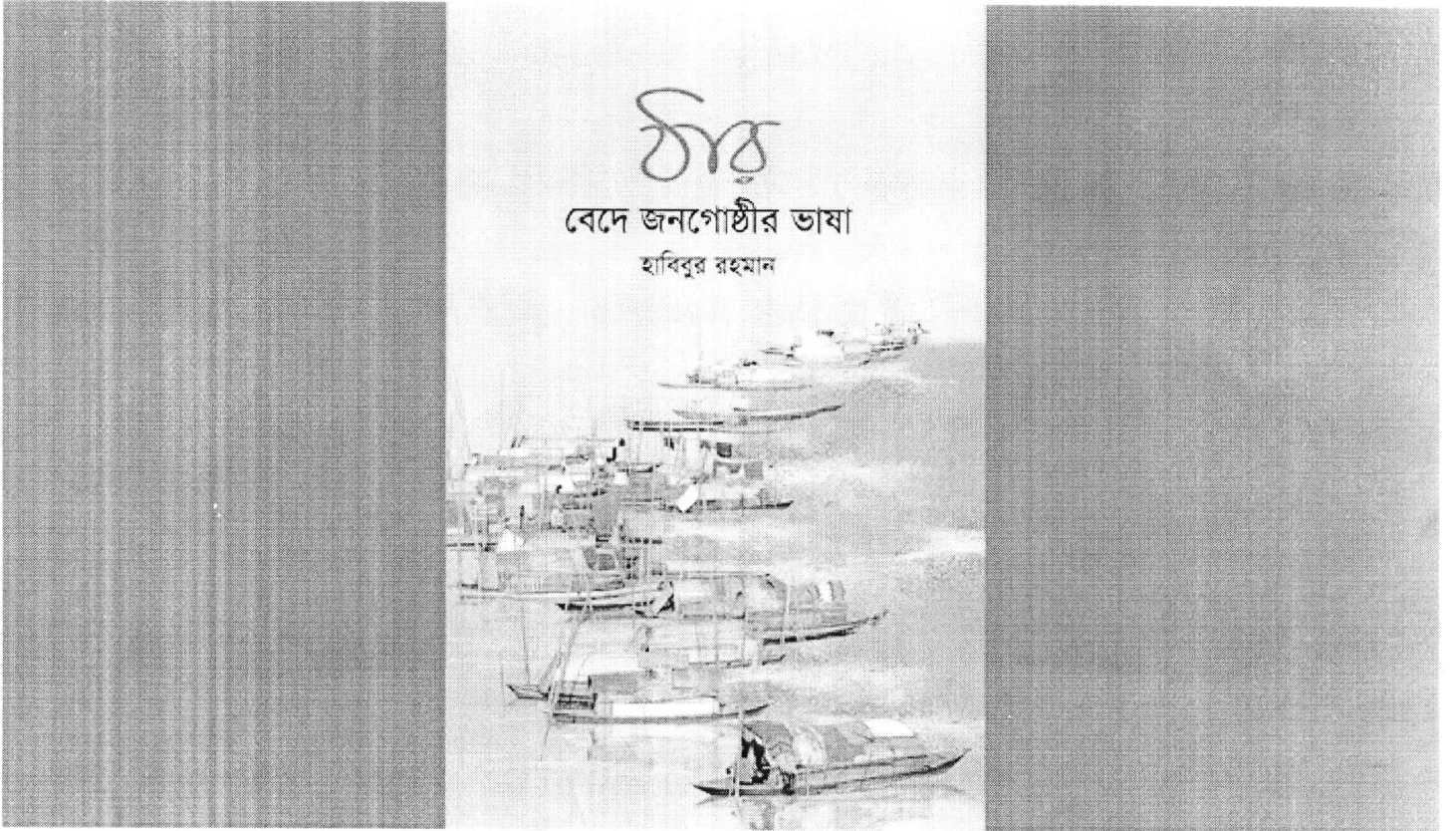
সমকাল

f t in y @ ৩ ই-পেপার English



🏠 » সারাদেশ » রাজশাহী

‘ঠার: বেদে জনগোষ্ঠীর ভাষা’ গ্রন্থ পাঠ-উত্তর ধারণা



ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

🕒 প্রকাশ: ৩০ মে ২০২৩ | ০৭:৪৩ | আপডেট: ৩০ মে ২০২৩ | ০৭:৫৭



বাংলাদেশ টুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি হাবিবুর রহমান ২০২২ সালে একটি চমৎকার গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম ‘ঠার: বেদে জনগোষ্ঠীর ভাষা’। দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল হিসেবে প্রকাশিত হয় গ্রন্থটি। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হিসেবে গ্রন্থটি যেমন চমৎকার তেমনি একটি ভাষার আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সহজতর উপায় কী হতে পারে- তারও একটি চমৎকার দিক নির্দেশনা এই গ্রন্থটি।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে ১৭তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ফলে পেশাগত ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি তার যে অনুরাগ থেকে গিয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপ এই গ্রন্থটি উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মোট ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইটিতে প্রথমত ভাষা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ একটি বর্ণনা রয়েছে। যেখানে ভাষার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উদ্ভবের ইতিহাসসহ বিভিন্ন মতবাদ, ভাষার রূপভেদ ও বৈচিত্র্যের বিষয়গুলো দারুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, তাই এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কখন, কীভাবে ভাষার উৎপত্তি ঘটল, তার বিবর্তনের ধারাটি কীরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলোর একটি সারসংক্ষেপ বলা চলে প্রথম অধ্যায়কে।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই বেদে জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তাগত পরিচয় এবং ঠার ভাষার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা লক্ষ করা যায়। বেদে বা বেদিয়াই বাংলাদেশের একমাত্র জাতি যারা যাযাবর জীবনযাপন করে। এই দৃশ্য একসময় খুবই পরিচিত ছিল- চৈত্রের দুপুরে বাতের ব্যথা সারানোর ডাক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল মেয়ে, মাথায় তাদের বোঁচকা আর কোলে কাপড় দিয়ে বাঁধা ছোটো শিশু। ডেকে চলছে- ‘এ-ই সিঙা লাগা-ই, সাপ খেলা দেখা-ই, দাঁতের পোকা ফেলা-ই, বাতের ব্যথা সারা-ই.....’। তাবিজ কিংবা ওষুধ বিক্রি করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত তারা। অনেকে তাদের একটু একটু ভয়ও করত। তারা নাকি জাদু জানে, তন্ত্র-মন্ত্র জানে এমন বিশ্বাসও অনেকের আছে। এদের পরিচয় নিয়ে মূলধারার মানুষদের তেমন কোনো ধারণা

কিংবা আগ্রহ নেই। দেখতে কিছুটা বাঙালির মতো হওয়ায় এদের আলাদা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে তেমন কোনো উৎসাহ কারো মধ্যে কাজও করে না। পেশা দিয়েই তাই তাদের পরিচয় নির্ধারণ করে অনেকে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা বাংলাদেশের অন্যতম একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। বেদে শব্দটির উৎপত্তি বৈদ্য থেকে বদ্যি থেকে বাইদ্যা হয়ে বাদিয়া বা বেদে হয়েছে বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন এলাকার মানুষদের কাছে এলাকাভেদে তারা ‘বেদে’, ‘বাদিয়া’, ‘বেদিয়া’, ‘বাইদিয়া’ বা ‘বাইদ্যা’ নামে পরিচিত। এরা মূলত সমাজের মূলস্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ একটি জনগোষ্ঠী। হাবিবুর রহমান পেশাগত কারণেই তদন্তের সূত্রে বেদেদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের প্রতি আগ্রহের জায়গা থেকে গবেষণা শুরু করেন। বেদের জাতিগত পরিচয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তেমন কোনো লিখিত তথ্য না পেলেও ঐতিহাসিকদের গবেষণার শরণাপন্ন হয়ে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই ‘ঠার ভাষা’ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং চমৎকার অথচ প্রায় সকলের দৃষ্টির অগোচরে থাকা সেই ভাষা নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত। খুব ক্ষুদ্র পরিসরে ঠার ভাষার অবস্থান। কেবল বেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এর পরিসীমা। এর কোনো লিখিত রূপ নেই।

বেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিও বিরল। ঠার ভাষায় কোনো সাহিত্যও রচনা হয়নি। ফলে ঠার ভাষা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হওয়ার সুযোগও ছিল না, এমনকি নেইও। তবে বেদে গবেষক শংকরলাল দাশ মনে করেন, প্রাগৈতিহাসিক কাল ধরে মানুষের চিত্তাকর্ষণ করার লক্ষ্যে বেদে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন চটুল গান ও মন্ত্র রচনা করেছে, যদিও তা মৌখিক ভাষা ছাড়া লিখিত কোনো দলিলে পাওয়া যায় না। তারা ঠার ভাষায় রচিত মন্ত্র আবহমান কাল ধরে ঝাড়ফুঁকের কাজে ব্যবহার করেছে। তাদের গানের ভাষায় উঠে এসেছে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসের নাম, সাপের নাম, বিভিন্ন উপাসক দেব-দেবীর নাম, বিপরীত লিঙ্গস্তবক, প্রেম-বিরহ, আবেগ-বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি। তবে বেদেদের সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, বেদে জনগোষ্ঠী একসময় নিজ এলাকা বা পরগণায় রাজা-বাদশাহ বা জমিদারদের পেশাদার গুপ্তচর হিসেবে কাজ করত। গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে এই ‘ঠেট’ বা ‘ঠের’ ভাষাই তাদের নিজস্ব ভাষা হিসেবে স্থান করে নেয়, যা তাদের পেশাগত কাজের

গোপন ভাষা হিসেবেও স্বীকৃত। কালের বিবর্তনে বর্তমানে এটি বেদে জনগোষ্ঠী নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে এসে গবেষক বর্তমান আধুনিক ভাষা গবেষণার দৃষ্টি ও পদ্ধতির সঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনা এনে ঠার ভাষার পরিচয়কে পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন। মার্কিন দার্শনিক ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জনক হিসেবে সর্বজনবিদিত। ভাষাবিজ্ঞানে তিনি যোগ করেছেন ‘রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ’ তত্ত্ব। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মিল রয়েছে যা মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনি ভাষাবিজ্ঞান ও এর প্রায়োগিক বিষয়সমূহ মানবমন সংক্রান্ত গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেন। তাঁর মতে, ‘ভাষা একটি মানসিক প্রক্রিয়া।’ মানুষের ধারণাগত এবং ভাষাগত সৃজনশীলতা বিভিন্ন মানসিক অনুষঙ্গের সাথে জড়িত এবং কিছু মানসিক সংগঠনের অস্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীর সকল ভাষা সর্বজনীন পদবিন্যাস রীতি অনুসরণ করে। বাক্যে পদবিন্যাস রীতি কাঠামো দুই ধরনের- ‘গভীর কাঠামো’ ও ‘উপরিকাঠামো’। এর ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল ভাষার জন্যই তিনি ‘বিশ্বজনীন ব্যাকরণ’ ও মানবমনের মস্তিষ্কজাত বিমূর্ত ভাষাবোধের পরিচয় ব্যক্ত করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল ভাষাতেই রয়েছে সসীম শব্দ এবং অসীম বাক্য। গবেষক হাবিবুর রহমান এই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ভেতর দিয়েই যুক্ত করেছেন ঠার ভাষাকে। পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ ভাষার (অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুরোপুরি সক্রিয় ভাষা) মতো ঠার ভাষা সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং চর্চা করে।

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে হাবিবুর রহমান ঠার ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতির পরিচয় দিয়েছেন। বইটির চতুর্থ অধ্যায় সাজানো হয়েছে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে। খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ যেভাবে তৈরি করা হয় সেভাবে গবেষক ঠার ভাষার ব্যাকরণকে সাজিয়েছেন।

ব্যাকরণের আলোচনার শুরুতেই আসে ধ্বনিতত্ত্ব। বইটির পঞ্চম অধ্যায় ধ্বনিতত্ত্ব অর্থাৎ ঠার ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিতত্ত্বের প্রাণ বা মূল বিষয় হলো ধ্বনি, ধ্বনিমূল এবং বর্ণ-সম্পর্ক। ঠার ভাষার এগুলো নিয়ে গবেষক এ পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ঠার ভাষায় বাংলা ভাষার ধ্বনি, ধ্বনিমূল ও বর্ণগুলো ব্যবহৃত হলেও তা কখনও পরিবর্তিত উচ্চারণে আবার কখনও তা একই উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। তবে যেহেতু ঠার ভাষার লিখিত রূপ নেই সেহেতু এর কোনো বর্ণ ও

বর্ণমালাও নেই। ধ্বনি বিশ্লেষণ পর্যায়ে দেখা যায় বাংলা ভাষার ৫০টি বর্ণকে ভিত্তি করেই ঠার ভাষার পরিসর। তবে ৫০টি বর্ণের মধ্যে ঙ, ঞ, গ, ড়, ঢ়, য়, ঞ, ঞ, ঞ, ঞ- এই ১০টি কখনোই শব্দের প্রথম বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এছাড়া বাকি ৪০টি বর্ণের মধ্যে ক, খ, গ, ঘ, চ, জ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, হ, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ- এই ৩৫টি বর্ণের ক্ষেত্রে ঠার ভাষায় এগুলো পরিবর্তিত হয়ে ‘ঝ’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- চশমা থেকে ঝশমা কিংবা বায়ান্ন থেকে ঝায়ান্ন। অন্যদিকে, বাকি পাঁচটি অর্থাৎ শ, ষ, স, ছ, ঝ- এই বর্ণগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় এগুলো বদলে ‘ন’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- শরৎকাল থেকে নরৎকাল কিংবা সবুজ থেকে নবুজ। ঠার ভাষার অবশ্য বেশ কিছু নিজস্ব মৌলিক শব্দও রয়েছে।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে রূপতাত্ত্বিক আলোচনা। গবেষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন ঠার ভাষার রূপতত্ত্ব। রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় শব্দ ও রূপ। ঠার ভাষায় শব্দ ও রূপ কীরূপ, তার গঠনপদ্ধতি ইত্যাদির আলোচনা এখানে এসেছে। ঠার ভাষার রূপমূলে ৩টি প্রধান বিষয় লক্ষণীয়। যথা-

১. ঠার ভাষায় কিছু সংখ্যক খাঁটি শব্দ রয়েছে। এই শব্দগুলো প্রচলিত আর কোনো ভাষাতে লক্ষ করা যায় না। যেমন- নৌকা শব্দটি ঠার ভাষায় বিরকি। সাপ, দুধ, পানি, লবণ শব্দগুলো যথাক্রমে মৌরো, বোমকাই, নিরানি/নিরেনি, পিঙের/পিংয়ের।

২. উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা শব্দ অপরিবর্তনীয়রূপে সরাসরি ঠার ভাষায় অন্তর্ভুক্ত। যেমন- বাংলা শব্দ দিন, মাস, বছর, ডান, নিচে, ঠোঁট, রাজি ইত্যাদি শব্দগুলো ঠার ভাষাতেও একই।

৩. ঠার ভাষায় প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দসমূহের সামান্য পরিবর্তিত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মূলত কিছুসংখ্যক ঠার শব্দ, বিদেশি শব্দ ও হুবহু বাংলা শব্দ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার শব্দসমূহের এই ধরনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- বাংলা কলস থেকে ঠার ঝলস কিংবা বাংলা কলম থেকে ঠার ঝলম ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনায় এসেছে বাক্যতত্ত্ব। বাংলা বাক্যতত্ত্বের কাঠামো অনুসরণ করেই গঠিত ঠার ভাষার বাক্যতত্ত্ব। হুবহু একই কাঠামো মেনে তা গঠিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে

বাগার্থতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ে গবেষক ঠার ভাষার শব্দসমূহের তালিকা দিয়েছেন।

দশম অধ্যায়ে গবেষক ঠার ভাষা সংরক্ষণে গ্রহীত পদক্ষেপ ও ঠার ভাষার উন্নয়ন ভাবনা শীর্ষক প্রস্তাবনাসমূহগুলো উপস্থাপন করেছেন। এনিয়ে আয়োজিত নানা কর্মসূচি, সেমিনার ও আলোচনার সচিত্র উপস্থাপন এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন।

একাদশ অধ্যায় শেষের আগে গবেষক তার নিজস্ব প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার জায়গাটি ব্যক্ত করেছেন। বেদে জনগোষ্ঠী, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আগ্রহ গড়ে উঠুক, তাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক সেই প্রত্যাশা রেখেছেন।

গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ভাষা গবেষণার একটি চমৎকার রূপরেখা লক্ষ করা যায়। ঠিক কীভাবে কোনো ভাষা নিয়ে গবেষণা করে তার উপস্থাপন করলে ভাষা-গবেষক থেকে সাধারণ পাঠক পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারবে এবং ঐ ভাষাটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে- তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই বইটি। এছাড়া অবহেলিত ও অনালোচিত বেদে জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও জানা যাবে অনেক কিছু। অতীতে বহুপূর্বে কিছু কাজ হলেও বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে বেদে জনগোষ্ঠী, তাদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল ধারণা লাভের জন্যও এই বইটি মূল্যবান। সবশেষে, এই গ্রন্থটি ভাষা গবেষণার বই হলেও আত্মজৈবনিক ধারাও। এখানে গবেষকের কর্মজীবনে বেদে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়, তাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠা এবং কীভাবে তাদের অপরাধজগৎ থেকে বের করে আনার উদ্যোগ গ্রহীত হয়েছিল সেসবও জানা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণায় ‘ঠার: বেদে জনগোষ্ঠীর ভাষা’ বইটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ সংযোজন। একই সঙ্গে বেদে জনগোষ্ঠীদের পরিচয়, তাদের ভাষা সম্পর্কে যেমন স্বচ্ছ একটি ধারণা এই বই থেকে পাওয়া যায়, তেমনি ভাষা গবেষণাপত্র প্রস্তুতের একটি দিক-নির্দেশনা হিসেবেও এটি চমৎকার।

বিষয় : বই ঠার: বেদে জনগোষ্ঠীর ভাষা হাবিবুর রহমান